ওগো অবলা! ওগো রণরঙ্গিণী!

বনি আমিন

দিনক্ষন মাসটি ঠিক মনে নেই, তবে বছরটি এখনো স্মৃতির সিন্দুকে যক্ষের ধনের মতো ঠাঁই আটকে আছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় সাহিত্য-সাংস্কৃতি চর্চা ও 'নেতা-পুজা'র রাজনীতি'র পাশাপাশি সুন্দরী মেয়েদের হাত দেখার একটি বাড়তি গুন আমাদের দু'কক্ষসাথী'র বেশ ছিল। দেবেশ দাস নামে আমার এক বাল্যবন্ধু যৌবনের খিড়কীতে পা' রাখার সাথে সাথেই সুন্দরীদের সান্নিধ্যলাভের একটি অভিনব উপায় 'কুমারী-হস্ত দর্শন' বিষয়ে দিক্ষীত করে আমার গা'য়ে ঝাড় ফুক দিয়ে আশির্বাদ করে দেয়। সেই থেকে যাত্রা শুরু। শত শত অবলার কোমল হস্তদর্শনে ক্লান্ত আমি শেষাব্দি এক সবলার কঠিন হস্তে নিজেকে সঁপে দিয়ে স্বইচ্ছায় যাবজ্জীবন বন্দিত্ব বরন করে নিয়েছিলাম। আর সেই কারনেই 'হস্ত দর্শন' বিষয়টি আমার স্মৃতির সিন্দুকে একটি অমোচনীয় অধ্যায় হিসেবে রয়ে গেল। দেবেশে'র দিক্ষায় দিক্ষীত আমার এ বিরল প্রতিভা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের মধ্যভাগে মুকুল থেকে পুষ্পতে প্রস্ফুটিত হয়ে ধীরে ধীরে পরিপূর্ণতা লাভ করে। আর সেই বিদ্যা'র কিছু অংশ গৃহশিক্ষকের ন্যায় আমিও অতি যতনে আমার সহপাঠি/কক্ষসাথী সিলেটে'র নজির আহমেদকে (নিউ ইয়র্ক বাসী) আমি ধীরে ধীরে তালিম দিয়ে শিক্ষিত করে তুলি।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রাবাসের ছাদে ১৯৮১ সনের সেপ্টেম্বরে অনার্স তৃতিয় বর্ষের ছাত্র স্মৃতিচারক, পেছনে পাহাড়ঘেরা লাল ইটের গাঁথুনিতে স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র অডিটোরিয়াম।

নজির ও আমার এ প্রতিভা ছাত্র আবাসিক হলের আঙ্গিনা ডিঙিয়ে বোরাকের গতিতে আমাদের 'মঞ্জিলে মোকাম' অর্থাৎ ছাত্রী আবাসিক হলের দুয়ারে গিয়ে একদিন পৌঁছে যায়। ধীরে ধীরে অতি বিনয়ী ও গুরুভক্ত কিছু সাগরেদও আমাদের জুটে যায়। সাগরেদরা যার যার ডিপার্টমেন্টে অতি শ্রদ্ধার সাথে আমাদের দু'জনের নির্ভুল হস্তদর্শন দক্ষতা সম্পর্কে তাদের সহপাঠিদের কাছে গুনকীর্তন ও প্রচার শুরু করে দেয়। অনেক সাগরেদ তাদের পছন্দের বান্ধবীকে 'পাম্প-পট্টি' দিয়ে আমাদের হাতে তার হাত-পড়িয়ে তাদের পক্ষে ভাগ্যগননা করিয়ে নিত। সুন্দরী অবলাদের প্রতি নজিরের বরাবরই সুনজর ছিল। সুন্দরীদের বালক-বন্ধুদের সাথে নজির বন্ধুত্ব স্থাপন করতো। এ ধরনের কোন প্রেমিক জুটির মধ্যে ঝামেলা চলছে বলে মনে করলে নজির তাদের প্রতি বিবেচক হয়ে উঠতো। বালক-বন্ধুরা যেসব বান্ধবীদের ভুল বুঝতো দেবদুতের ন্যায় নজির ভবিষতদ্রষ্টার ভুমিকায় অবতীর্ন হয়ে সেসকল বান্ধবীদের নিভৃতে কাছে ডেকে নিয়ে উপদেশ দিত। মেহদীরাঙা আলপনায় ঝাপসা হয়ে যাওয়া সুন্দরীদের রেখাগুলোকে উদ্ধার করার চেষ্টায় অতি যত্ন করে 'ইরেজারের' মতো নজির তাদের হাতে নিজের হাত ঘষতো।

হাত দেখে পাথর প্রেসক্রিপশন করা আমাদের নীতিগর্হিত কাজ ছিল। পাথর কেনার মত অহেতুক খরচা ছিলনা বটে তবে সাধনা ও ভক্তির উপদেশ থাকতো অনেক। শুক্লা রাতের পঞ্চমী অথবা একাদশীতে জোছনার আলোতে ঈশানমুখী আকাশের দিকে তাকিয়ে রাতের প্রথম প্রহরে সন্ধ্যা মুখার্জীর 'মধু মালতি ডাকে আয়' অথবা শরতের সাঁঝে জানালার গরাদ ধরে সতী'র 'হায় বরষা এমন ফাগুন কেড়ে নিওনা' এমন ধরনের গান গুনগুনিয়ে প্রিয়জনকে স্মরণ করার জন্যে 'নছিয়ত' করতাম। অথবা কৃষ্ণ পক্ষের মধ্যভাগে কোন রাতে উল্কা ছিটকে পড়ার সময় যার নাম তাৎক্ষনিক মনে আসবে তাকেই জীবনসাথী হিসেবে পাবে বলে কাগজে গ্যারান্টি দিয়ে আমি নির্দ্বিধায় 'অটোগ্রাফ' এঁকে দিতাম। আমাদের এ উদার প্রেসক্রিপশনে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রেমিকাঙ্গনে' কাজ হতো বেশ। মাসের বাড়তি খরচা হিসেবে টাকা পাঠানো থেকেও বাবা-মা কিছুটা নিস্কৃতি পেয়েছিল তখন। ১৯৮১ থেকে ১৯৮৫ সনের দিনগুলোতে নির্দিষ্ট তিথী ও চাঁদের রাতে শামসুন্নাহার (নুতন) হলের ছাদে কোন জীবন্ত বস্তুর নড়চড়া দেখলে বাঁশের চোঙায় কাঁচ ফিট করা দুরবীন হাতে দাঁড়িয়ে থাকা ভক্ত বা সাগরেদের তখন হৃদপিন্ডের চঞ্চলতা বেড়ে যেত আর উৎফুল্লে বলে উঠতো "ওরে দেখ, দেখ, গুরুর প্রেসক্রিপশনে কাজ হয়েছে। শিপ্রা নিশ্চয় ওর 'মানত' নিয়ে ছাদে উঠেছে।"

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্যাটেল ট্রেনের জানালায় উচ্ছল একদল সুন্দরী অবলা

গেরুয়া পোশাক এবং কপালের মধ্যখানটায় চন্দনের তিলক না থাকলেও শার্টের কলার উঁচিয়ে আমরা দুজন ডান-বাম আধাডজন 'বেলবটম' সাগরেদ নিয়ে যখন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বা ক্যান্টিনে সদর্পে হাঁটতাম তখন মনে হতো অনেক সরলমনা সুন্দরী তাদের গরল হাতের রেখাগুলোর গতি আবিষ্কারের জন্যে আমাদের দিকে হাত বাড়িয়ে বসে আছে। শিষ্য নজির প্রথমে বিনে পয়সায় হাত দেখা শুরু করলেও ওস্তাদের ইঙ্গিতে পরে চা ও সিঙারার বদলে ক্যান্টিন থেকে তার পেশা শুরু করে। উপরি হিসেবে গুরুর জন্যে একটা শিমুল তুলা-পুচ্ছের 'গোল্ডলীফ' সিগারেট নজির তার অভাগী মক্কেল থেকে আদায় করে নিত। ধীরে ধীরে আমাদের যশ ও খ্যাতির(!) কারণে পারিশ্রমিকের পরিমানও বাড়তে থাকে। সুন্দরীদের নিজ হাতে রান্না খিচুড়ী ও নানা সুস্বাদু রান্না খেতে ছাত্রি আবাসিক এলাকাতে গমনাগমন আমাদের জন্যে একটি নিত্যনৈমিত্তিক রীতিতে পরিণত হয়ে যায়। দলবেধেঁ গুরু-শিষ্য কয়েকজন যখন প্রতি সপ্তাহে বন্ধের দিন বিকেলে সবুজ পাহাড়ের পাদদেশে স্থাপিত শামসুন্নাহার (নুতন) হলের দিকে যাত্রা করতাম তখন অনেকেই বুঝতো অভিযাত্রী আমরা কেউ ক্লাশ বা পরীক্ষার নোট দেয়া-নেয়ার জন্যে নয় বরং সুন্দরীদের পাশ ফেল ও প্রেম-বিচ্ছেদ বিষয়ে ভবিষ্যৎবানী প্রদানের জন্যেই যাচ্ছি।

শুক্রবার ঠিক দুপুর একটায় নজির সহ আমরা চারজন 'হস্তরেখা বৈঠক' করতে যাবো, খিচুড়ি রাঁধবে শিবানী রায়, কবুতরের মাংস রান্নার দায়ীত্ব ডেইজির ও চায়ে'র ব্যবস্থা শিপ্রার থাকলো। বৈঠকে

'খুঁটি' হিসেবে ওদের সাথে নবাগত আরো দু/একজন বান্ধবী থাকবে বলে কক্সবাজারের হলুদিয়া পাখি ফিলোসোফী ডিপার্টমেন্টের মনোয়ারা (মনু) আমাদের জানালো।

সকালে নাস্তার পয়সা বাঁচানোর ধান্দায় সুর্য নব্বুই ডিগ্রী বরাবর খাড়া হওয়া পর্যন্ত আমরা দু'জন ডান-বাম গড়াগড়ি করে সেদিন ইচ্ছে করে বিছানায় লেপটে ছিলাম। আর তাছাড়া নজির ও আমি দুজনে ইতিমধ্যে স্বপ্নে একবেলা কবুতরের মাংস দিয়ে খিঁচুড়ি সাবাড় করে ফেলেছিলাম বলে ক্ষুদাও তেমন ছিলনা। সুন্দরীদের হাত দেখার পাশাপাশি দুপুরে শামসুন্নাহার হল আঙ্গিনায় তাদের হাতের রান্নায় একপ্রহর ও দ্বিপ্রহরের খাওয়া একসাথে 'মেরে দেব' ভেবে নিজেকে আরো বুভুক্ষ করার জন্যে বিছানা ছেড়েই দুজনে মেঝের উপর দু'চারটা 'বুক-ডন' মেরে নিলাম।

'খুঁটি' থেকে 'জুটি' বাঁধার নিয়তে শফিক নামের একজন 'ডিসকো হুজুর' সহ আরো দুজন সেযাত্রা আমাদের সাথে ভক্ত হিসেবে সামীল হয়ে যায়। 'খুন ভারী মাঙ' সিনেমার কবীর বেদী'র মতো শুশ্মধারী মাঈজভান্ডারীর মুরিদ শফিক অনিয়মিত সাপ্তাহিক এক ওয়াক্ত নামাজ পড়লেও 'ইশক্' এর জন্যে মজনু হওয়াই ছিল জীবনে তার একমাত্র আরাধ্য বিষয়।

দুপুর ঠিক সাড়ে বারোটার দিকে চারজনের অভিযাত্রিদল আমরা শামুসন্নাহার হলের সামনে টিলার উপরে স্থাপিত পুরাতন ও ভঙ্গুর শনে ছাওয়া ছাপড়ার ক্যান্টিনে গিয়ে হাজির হই। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকি শিবানী, শিপ্রা, কবিতা, মনু, ডেইজি ও অদেখা তাদের আরো কয়েকজন নুতন বান্ধবীদের জন্যে। নজিরের পকেটে ডিসকো হুজুর শফিক এক প্যাকেট গোল্ডলীফ সিগারেট আগেভাগেই ঢুকিয়ে দিয়েছে যাতে মনু'র হাতটি সে তার পক্ষেই পড়ে দেয়। রবি রেখার উৎস যদি চন্দ্র রেখার কাছাকাছি হয়ে থাকে এবং জীবনরেখার সাথে মিশে তালুর ঠিক মাঝখানে যদি কোন চতুর্ভুজ সৃষ্টি হয়ে থাকে তবেই শফিকের পক্ষে মনু'র মাথা চক্কর খাইয়ে দিতে পারবে বলে নজির আশ্বাস দিল। যদি রেখা ব্যতিক্রম হয় তবে আরো বাড়তি দু'প্যাকেট সিগারেটের সাথে তিন শলা 'বুইল্যা' (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনের অতি পরিচিত ও বিখ্যাত গঞ্জিকা) দক্ষিণা দিতে হবে বলে নজির অগ্রিম শফিককে জানিয়ে দেয়। আমি শুধুমাত্র নবাগত সুন্দরীদের হাত দেখবো বলে আগের রাতে দু'চিলিম টেনে হস্তরেখা বিশারদ ডঃ কিরোর বইটির দু'পাতা উল্টে নিয়েছিলাম যাতে কোমল হস্তধারিনীদের কোমল হৃদয়ে সহজে আমি শ্রদ্ধা স্থাপন করতে পারি। কিরোর সুত্রগুলোই বারবার তখন মনে মনে আউড়াচ্ছিলাম। কিন্তু তবুও অপেক্ষার সময় যেন ফুরাতে চায়না। বন্ধের দিন বলে 'ঠাঠা রোদে'ও হলে'র সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আরো অনেক ছাত্র/ছাত্রিদের চুটিয়ে আড্ডা চলছিল। অধৈর্য্য নজির দুরে দাঁড়িয়ে থাকা পদার্থবিদ্যা বিভাগের, পুরাতন এক শিষ্য, মিনাক্ষীকে দেখে আমাদের কাঙ্খিত শিষ্যদের কথা জানতে চেয়ে এগিয়ে যায়। আমি দুর থেকে লক্ষ্য করছিলাম মিনাক্ষীর সাথে কথা বলতে বলতে নজিরের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছিল। ভয়াবহ এক দুঃসংবাদ নিয়ে মিনিট পরে মিনাক্ষী ও তার সাথে গোলাপী-ওষ্ঠের জুনিয়র এক ছোটবোন (!) সহ নজির বিমর্ষমুখে ছাপড়ার কাছে ফেরত আসে। মিনাক্ষী জানালো আগের রাত শুক্লাপক্ষের একাদশী হিসেবে মনোয়ারা (মনু), কবিতা, ডেইজি, শিবানী সহ আরো কয়েকজন সুন্দরী যার যার 'মানত' নিয়ে যথারীতি চন্দ্র-দর্শনে রাতে হলে'র ছাদে উঠেছিল। সেখানেই হস্তরেখার প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী একথা-ওকথায় মনু ও শিবানী দুজনের কাঙ্খিত প্রেমিকপ্রবর যে একই ব্যাক্তি ব্যাপারটি উদঘাটিত হয়ে যায়। তাদের প্রেমিক সুঠামদেহী সুদর্শন যুবক শ্রীমান সমীর দত্ত যে একসাথে 'ডাবল সার্ভিস' দিত সেটা আমরা দুজনের কারো হাতে সেরকম কোন রেখা দেখিনি। আমার ও নজিরের

প্রেসক্রিপশন এবং তাদের ত্রিভুজ প্রেমের বিষয়টি শেষপর্যন্ত হাতাহাতি থেকে ভয়ংকর মারামারিতে পরিণত হয়ে যায়। সেরাতে ঐ মারামারি এক পর্যায়ে ছাদ থেকে নীচে ডাইনিং রুম পর্যন্ত অধঃপতিত হয়েছিল। 'প্রেমিক-হরন' বিষয়টি চাপা পড়ে একপর্যায়ে ঘটনাটি রূপান্তরিত হয় রাজনৈতিক মতভিন্নতার দ্বন্দে। 'পিতা' ও 'ঘোষক' এর আদর্শে বলীয়ান হয়ে 'নীতিহীন' 'নেতাপুজারী' দুপক্ষ অবলা তখন রনরঙ্গিনী মুর্তিতে একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিশালদেহী নেত্রী কুমিল্লার নার্গিসের ঘুষিতে মনু'র নাক 'থেতা' হয়ে যায়। কেশবতী কন্যা ডেইজির শতগাছি কেশ উৎপাটিত হয়ে শিবানী'র অষ্টআঙ্গুলে জড়িয়ে যায়। ডাইনিং রুমের একটি চেয়ার উড়ে এসে পড়ে শিবানী'র পায়ের গোড়ালিতে। উক্ত দক্ষযজ্ঞে আহত হয়ে সে রাতে শয্যাশায়ী হয় পাঁচ/ছ জন অবলা সুন্দরী। কারো শারিরীকাবস্থা বিছানা ছাড়ার মত ছিলনা। ভেস্তে যায় আমার নবাগত সুন্দরীদের হস্ত-দর্শন ও আমাদের সকলের দুবেলার বুভুক্ষতা একবেলায় নিবারন করার পরিকল্পনা। মনুদের হলের জানালার দিকে চেয়ে থেকে যখন একরাশ হতাশার মাঝে আমি ভাসছিলাম ঠিক তখনি আলতো করে চোখ নীচে নামিয়ে দেখি মিনাক্ষী'র সাথী শিলা নামের সুন্দরী ছোটবোনটি(!) আমার দিকে তার দুটি কোমল হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, তার অচেনা-অজানা হস্তরেখাগুলোর ভবিষ্যৎ গতি নিরূপনের জন্যে। পারিশ্রমিক হিসেবে অভিযাত্রী চারজনকে ছাপড়া দোকান থেকে মিনাক্ষী সে ভরদুপুরে ক্ষুদ্র একখন্ড মহিষের মাংসে পুরু প্রলেপ দেয়া কয়েকটি 'আলুর চপ' খাইয়েছিল। অর্ধভুক অভিযাত্রী দল সকলে নিদারুন মনকষ্ট নিয়ে সেদিন হলে ফিরেছিলাম। পথে যেতে যেতে বারবার আমার মানসপটে ভেসে ওঠে মেয়েদের মারামারির ঘটনাটি। কারণ তার আগে আমি মেয়েদের 'চুলোচুলি' শুনেছি অনেক কিন্তু 'যুষা-ঘুষি' বা 'ডান্ডা নিয়ে প্রতিপক্ষকে ঠান্ডা করা' এরকম যুদ্ধের কথা আগে কখনো শুনিনি। দ্বিতিয়বারের মতো অনেক বছর পর বন্ধু যুগল জনাথন ও স্যান্ড্রার নিমন্তনে ১৯৯১ সনের মাঝামাঝি আমি ইংলিশ চ্যানেলের পাড়ে অবস্থিত ডোভার আর্ট কলেজের একটি নাট্যানুষ্ঠান দেখতে গিয়েছিলাম। নাটকের একাংশে ত্রিভুজ প্রেমের দু-প্রেমিকা 'প্রেমিক ছিনতাই' এর অভিযোগে একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ঘুষা-ঘুষি শুরু করে দেয়। আমার হাতে রক্ষিত স্বল্পমুল্যের ক্যামেরা দিয়ে অমূল্য সেই নাটকিয় দৃশ্যটি তখন আমি যত্ন করে ধরে রাখি। নাটকে মারামারির দৃশ্যটি প্রবাসে আমাকে একদশক পেছনে শামসুন্নাহার হলের মেয়েদের সেই দক্ষযজ্ঞের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল তখন। ঠিক তার আড়াই দশক পরে গত ১৫ মে ২০০৬ ঢাকার ইডেন গার্লস কলেজে দুপক্ষ ছাত্রীর প্রকাশ্য লাঠিপেটা, ঘুষাঘুষি ও কুস্তি দেখে আমাকে পুনরায় স্মৃতির সিন্দুকের ডালা উল্টে দেখতে হলো। ভাবছি ওদের এই তথাকথিত দলিয় মারামারির পেছনে আমাদের মত কোন ধীমান হস্তরেখা বিশারদের ভাগ্যগননার কারন নেইতো!

বনি আমিন, সিডনী

ইডেনের ছাত্রিদের মারামারির দৃশ্য দেখার জন্যে পাশের পাঞ্জায় টোকা মারুন